এই সময়

কথাসরিৎ

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে / দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো! /
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে / হে ক্লান্ত উর্বশী।

— সমর সেন

নির্বাচনী

করোনা-পর্বের মধ্যেই আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচন। এটি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দীর্ঘ ব্যবধানের পর পুনরায় নির্বাচনী লড়াই। যার ফলাফলে আগামীর গতিপ্রকৃতি অনেকটাই ধরা পড়বে, বোঝা যাবে করোনা ও অর্থনৈতিক সংকটের যুগ্ম আঘাত ভোটদাতাদের কতটা প্রভাবিত করেছে। শাসক জোট এনডিএ ইতিমধ্যেই নিজেদের ঘর গোছাতে অনেকটাই সমর্থ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তারা যে নীতীশ কুমারকেই পুনরায় তুলে ধরবে, তাঁর সমর্থনে নরেন্দ্র মোদীর প্রকাশ্য বক্তব্যের পর সেটিও নিশ্চিত। এই মুহূর্তে মোদী ও নীতীশের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই তাদের তুরুপের তাস। লালুপ্রসাদ যাদবের অনুপস্থিতিতে জনমানসে তাঁদের আধিপত্য এখন প্রশ্নাতীত। যদিও নীতীশ কুমারের গত পাঁচ বছরের শাসনকাল বিশেষ উজ্জ্বল নয়, জেডিইউ এবং বিজেপি বারংবার তাদের প্রচারে তুলে ধরছে ২০০৫-এর আগে রাজ্যে উন্নয়নের অভাবের প্রসঙ্গটিকে। বিরোধী জোট কোনও বিকল্প রাজনৈতিক বয়ান পেশ করতে এখনও অসমর্থ। তাদের সমস্যা জটিলতর হয়েছে নির্বাচনী আঙিনায় লালুপ্রসাদ যাদবের অনুপস্থিতিতে, মোদী-নীতীশ জুটিকে রুখতে তিনিই হতে পারতেন বিরোধী জোটের ব্রহ্মাস্ত্র।

অথচ বিরোধী জোটের জন্য এটিই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। গভীরতম অর্থনৈতিক সংকট, পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা ও কর্মহীনতা, অতিমারীর ক্রমবর্ধমান প্রকোপ এবং বন্যা— নির্বাচনে শাসক গোষ্ঠীকে বেকায়দায় ফেলার যাবতীয় ইস্যু উপস্থিত। কিন্তু বিরোধীরা এখনও বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে অসমর্থ। লালুপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে তেজস্বী যাদবকে হাল ধরতে হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে তিনি এখনও অপরিপক্ক। প্রাথমিক ভাবে তিনি আশা জাগালেও পরবর্তী সময়ে জোট ধরে রাখা এবং নির্বাচনী প্রচারের যুগপৎ দায়িত্ব সামলাতে তাঁকে খুব একটা সফল বলা যাবে না। কংগ্রেসও নীতীশের বিকল্প হিসেবে তেজস্বীকে তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্ত। অন্য দিকে ভারতে নির্বাচন যখন ক্রমেই ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্দিষ্ট কোনও মুখ না থাকাটাও ক্ষতিকর। করোনার দরুণ বিহারে প্রচারের মাত্রা এখন অনেকটাই নিরুচ্চার, মূল মাধ্যমটি ডিজিটাল। সেখানেও অনেকটাই এগিয়ে শাসক জোট, তাদের সাংগঠনিক শক্তি এবং ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারে সামর্থ্যের দরুণ। তবে এটিও সত্য যে ভারতীয় রাজনীতি বহু ক্ষেত্রেই বিস্ময়কর ফলাফলের সাক্ষী থেকেছে, যার প্রমাণ গত বছর মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। বিহারও কি সেই পথে হাঁটবে?

ক্ষতি

ধূমপানের ফলে শুধু ধূমপায়ীদের ক্ষতি হয় তা নয়, আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, পরিবেশের উপর তার কু-প্রভাব মারাত্মক। বেশ কিছুকাল যাবৎ সিগারেটের ফিল্টার সর্বাধিক ক্ষতিকারক বর্জ্যের তালিকার বেশ উপরের দিকে রয়েছে। শহরাঞ্চলে আধপোড়া ফিল্টার জলে ধুয়ে নদীনালা হয়ে সাগরে পৌঁছয়। তার আগেই সে গতি স্তব্ধ হলে প্রায় এক বছরে মাটিতে মিশে প্রায় ছ'শো রকমের বিষাক্ত রাসায়নিকের দ্বারা ভূগর্ভস্থ জলস্তর দূষিত করে তা। মুশকিল হল, প্রতি দিন বেশ কয়েকশো কোটি সিগারেট যে কোনও বড় শহরের স্বাভাবিক

প্রণব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে যেমন বাঙালির অভিমান ছিল, তেমনই দুঃখও তিনি প্রধানমন্ত্রী না হওয়ায়

সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতেন, সেটিই তাঁর শিক্ষা

ভারতকে তিনি প্রাদেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি। জননেতাও হননি। কিন্তু তাঁর পরামর্শেই জাতীয় রাজনীতিতে তাবড় নেতাদের উত্থান-পতন। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

এএনআই

ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে বাংলা টেলিভিশন ও সংবাদপত্র এখনও পর্যন্ত একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতির গুণগান করে চলেছে। বাঙালির মনে দুঃখ হয়েছে যে ভারতের এক সুসন্তান চলে গেলেন। কিন্তু একটি নির্মোহ মূল্যায়ন দরকার প্রণব মুখোপাধ্যায় নামক এক রাষ্ট্রনেতার।

কিন্তু প্রণববাবু কি রাষ্ট্রনেতা না 'কূটনীতিক'? কারণ রাষ্ট্রপতি আর রাষ্ট্রনেতা এক নয়। সাধারণ বাঙালি, আশি এবং নব্বই দশকে তাঁকে 'হেরো প্রণব' বলে ডাকত। কারণ তিনি জনসমর্থন নিয়ে লোকসভায় জিততে পারতেন না। ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন তার প্রমাণ। ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি রাজ্যসভা এবং দিল্লি রাজনীতির অলি-গলি পেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বা নরসিম্হা রাও-এর বিশ্বস্ত মন্ত্রী এবং পরামর্শদাতা হিসেবে নিজের যোগ্যতা বার বার প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পাননি সে কথা অকপটে স্বীকার করতেন। শিশুসুলভ হাসি নিয়ে দ্বিধাহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। নিজের সম্পর্কে তাঁর নির্মোহ বিশ্লেষণও যে ঠিক ছিল, তার জন্যই তিনি বড় মাপের রাজনীতিবিদ।

এক সময় তাঁকে 'ফিক্সার' (বাংলা অনুবাদ করলে 'মুশকিল আসান') বলে ডাকা হত। রাজনীতিতে তাঁদের প্রয়োজন। তা না হলে রাজনীতির ক্রিকেট ময়দানে 'সিক্সার' মারা যায় না। তা ছাড়া রাজনৈতিক বসের সব কাজ সবার দ্বারা হয় না। '৭০-এর দশকে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সুখময় চক্রবর্তী (যিনি নেহরু আমল থেকে আর্থিক নীতির পারদর্শী এবং গুণী অধ্যাপক) এবং অশোক মিত্রর মতো বাঘা বাঘা বাঙালি অর্থনীতিবিদের তুলনায় রাজনীতিবিদ প্রণববাবু দশকের পর দশক, তাঁর বসদের সন্তুষ্ট করতে পারতেন তা সর্বজনবিদিত। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান বলুন আর অর্থমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলুন, প্রণববাবু যে কত কেরিয়ার রাজনীতিবিদদের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন, তা ক'জন রাজনীতিবিদ খোলা মনে স্বীকার করবেন? ২০০৪-এর পরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জমানায় তাঁর আর একটা নাম হয়েছিল 'ক্রাইসিস ম্যানেজার'। কিন্তু এত খাটুনির পরেও তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়নি ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরেও। রাজনৈতিক বস এবং ভারতের শাসকশ্রেণির একাংশ চায়নি বলেই হয়নি, না বাঙালি বলে হয়নি, সেই প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনও মানে হয় না। কারণ তার উত্তর অজানা।

ভারতীয় রাজনীতিতে 'মুশকিল আসান'-রা নতুন নন। ১৯৭০-এর দশকে যখন দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির টালমাটাল অবস্থা তখন ভারতীয় লোকদলে একজন ডিএন লাহিড়ী ছিলেন। হাল আমলে সমাজবাদী পার্টির অমর সিং, বিজু জনতা দলের পিয়ারি মোহন মহাপাত্র, তৃণমূলের মুকুল রায় (এখন বিজেপি-তে), বিজেপির অমিত শাহ এবং বহুদলীয় কর্পোরেট পেশাদার প্রশান্ত কিশোর। ইতিহাস কিছু মানুষকে মনে রাখে না। কারণ জননেতার যে জনপ্রিয়তা তার ধারে-কাছে থাকেন না তাঁরা। কিন্তু প্রণববাবুকে সুযোগসন্ধানী হিসেবে যারা এক সময় গাল পাড়ত, তারা বহু বছর আগে ঢোক গিলতে বাধ্য হয়েছে যে একজন তুখোড় 'মুশকিল আসান' কী করে রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন। রাষ্ট্রপতি না থেকেও পরবর্তী কালে আরএসএস-এর সভায় ভারতীয় রাজনীতির বহুদলীয় সংস্কৃতি ও সহিষ্ণুতার পাঠ এক স্কুল-শিক্ষকের মতোই পড়িয়ে এসেছিলেন। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েও আরএসএস-এর সভায় তিনি একটি অন্য বার্তা দিয়েছিলেন কারণ সেটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট। সেই সুযোগ সবার হয় না। সঠিক সুযোগ সঠিক সময়ে কাজে লাগানোর মতো রাজনীতিবিদ আর ক'জন হয়েছেন?

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে সাধারণ বাঙালি বলত, পশ্চিমবঙ্গের জন্য লোকটা কী করেছে? বহু সাধারণ মানুষের রাজনীতিবিদদের উপরে যেমন বিতৃষ্ণা থাকে, তার সঙ্গে বাঙালির কোথাও একটা আলাদা অভিমান ছিল। কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে এবং গ্রাম-মফস্সলের মানুষের মধ্যে আবুল বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরীকে (জনগণের মধ্যে গনি খান আর কংগ্রেসিদের মধ্যে বরকত-দা বলে পরিচিত) অনেকে আজও মনে রেখেছে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে গনি খান সম্পর্কে বলা হত যে, রেলমন্ত্রী হিসেবে বাংলার জন্য উনি অনেক কিছু করেছেন কিন্তু প্রণববাবু সম্পর্কে তেমন কথা শোনা যেত না। রেলমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের জন্য যে অনেক কিছু করা যায়, তা পরবর্তী কালে রামবিলাস পাসওয়ান, নীতীশ কুমার, লালুপ্রসাদ যাদব এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। তুলনায় বাঙালির একটি অভিমান ছিল যে অর্থমন্ত্রী হিসেবে গ্রাম-মফস্সল থেকে উঠে আসা এক দুঁদে রাজনীতিবিদ রাজ্যের জন্য তেমন কিছু করেনি। আসলে ভারতের স্বার্থ দেখতে গিয়ে প্রণববাবু নিজের রাজ্যের স্বার্থ আলাদা করে দেখতে যাননি। কারণ তিনি উদার মনের মানুষ হিসেবে অনেক বড় করে ভাবতে পারতেন।

> আরএসএস-এর সভায় বহুদলীয় সংস্কৃতি ও সহিষ্ণুতার পাঠ স্কুল-শিক্ষকের মতো পড়িয়ে এসেছিলেন। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েও একটি অন্য বার্তা দিয়েছিলেন কারণ সেটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট।

ভারতকে প্রাদেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন না কারণ তিনি রাজধানীতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বেশি সময় অতিবাহিত করেছিলেন।

কিন্তু বাঙালির অভিমানের সঙ্গে দশকের পর দশক জুড়ে দুঃখও আছে যেখান থেকে 'হেরো প্রণব'-এর তকমা জোর পেয়েছিল। সেই দুঃখ আজকের নয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানীর স্থানান্তর, বাংলার অগনিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর বলিদান, এবং সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস উপদলীয় রাজনীতির শিকার হওয়া, প্রায় সেখান থেকে এই দুঃখ বাঙালির। তার পর দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক বিপর্যয় এবং বাংলার অর্থনীতিতে ১৯৫০-এর দশক থেকে মাসুল সমীকরণের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল, সেই দুঃখ বাঙালির মনে দাগ কেটেছিল। হয়তো আজও আছে। তার পর ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গের যা ন্যায্য প্রাপ্য, তা বহুবার কেন্দ্রের বিভিন্ন দলের সরকার দেয়নি। প্রায় সেই সময় থেকে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' নামক শব্দবন্ধ চালু হয় বঙ্গীয় রাজনীতি-জগৎ, সংবাদমাধ্যম, শিক্ষামহল ও চায়ের দোকানের আড্ডার আলোচ্য বস্তু হিসেবে। ২০০৪ সাল থেকে প্রণববাবুর 'হেরো প্রণব'-এর তকমা মোছে কারণ জঙ্গিপুর থেকে তিনি দু'বার লোকসভা ভোটে জেতেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখনও একটি হার মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। সেই হার হল, এখনও পর্যন্ত ভারত একজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী দেখেনি।

১৯৯৬ সালে জ্যোতিবাবুকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দেখার পর ২০০৪ এবং ২০০৯ সালে প্রণববাবুর দু'টি সুযোগ ছিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধী হত্যার পর প্রণববাবুকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে, এ হেন গল্পগুজব এবং কানাঘুষো খবর সাংবাদিক মহলে ঘুরত। কিন্তু কংগ্রেসি রাজনীতিতে দল ছেড়ে দিয়ে আবার পুরনো দলে ফিরে আসা ব্যক্তিকে আর পাঁচটা দলের মতোই অবিশ্বাসের চোখে দেখা হত। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯৯১ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মাত্র পাঁচটি আসন পায়। তাই ২০০৪ এবং ২০০৯-এর পরে রাষ্ট্রপতি পদের একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেলেন বাংলার এক কৃতী মানুষ।

প্রণববাবুর মাথা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী এবং প্রায় কূটনীতির জাদুকর। শিক্ষা নিয়ে তাঁর অনেক চিন্তাভাবনা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। যেমন পৃথিবীর প্রথম ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের অন্তত পঞ্চাশটি নেই এবং গুটিকয়েক যারা পৃথিবীর নাম-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তাদের মধ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স আর দু'টি-তিনটি আইআইটি ছাড়া কেউ পাতে দেবার মতো নয়, এমন একটি কথা। সাম্প্রতিক অতীতে খুব কাছে থেকে তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছিল। একবার ২০০৮ সালের ২০ ডিসেম্বর দিল্লিতে, অমর্ত্য সেনের ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে একটি আন্তজাতিক কনফারেন্সে আর ২০১৩ সালের মে মাসে সিমলার ইন্ডিয়ান ইন্সিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি-তে। দু'বারই শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু কথা। সিমলায় প্রণববাবুর ভালো বক্তৃতার পরে ওই প্রখ্যাত গবেষণাকেন্দ্রের তৎকালীন চেয়ারম্যান গোপালকৃষ্ণ গান্ধী ঠাট্টা করে বলেছিলেন 'এত ভালো, ভালো নয়'। নিয়ম অনুসারে দু'টি বক্তৃতার শেষে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না। থাকলে একটি সাধারণ নাগরিকের একটাই প্রশ্ন ছিল। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং-এ নেই, তা ঠিক। কিন্তু আমাদের দেশ থেকে প্রতিভাধর বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, গবেষকরা কেন দশকের পর দশক বিদেশে পাড়ি দেন এবং তার সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের কম খরচের জন্য ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং-এ উপরে উঠতে পারছে না?

রাজনীতির বিষয়ে বাঙালির মন ভোলার নয়। একটি জাতিকে এত বার আঘাত দিলে যে ভারতের শাসকশ্রেণিকে (বড় কর্পোরেট পুঁজি যা অন্তত ১০০টি ধনী পরিবারের মধ্যে আছে) বুঝে নিতে হবে গোছের বাঙালি রাজনীতিবিদ এখনও তেমন একটা হুঙ্কার দিচ্ছেন না। কেন যে দিচ্ছেন না, কে জানে? এ হেন সম্মানহানির প্রতিশোধ আগামী দিনে কোনও বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী নিতে পারবেন? ভবিষ্যৎ বলবে সেই উত্তর। অন্তত ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে সেমিফাইনাল ম্যাচ আছে ২০২১ সালে। তবে 'হেরো বাঙালি'র তকমা ছাড়তে হবে। 'ভারতজয়ী বাঙালি' হতে শিখুন। তার জন্য সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দল, আন্দোলন ও ব্যক্তিকে একসঙ্গে সমবেত করার প্রচেষ্টা জারি থাক। প্রধান রাজনৈতিক বিরোধীকে পরাজিত করতে সকলকে নিয়ে চলার মানসিকতা প্রণববাবুর ছিল। সেই শিক্ষা বাঙালি রাজনীতিবিদরা যেন ত্যাগ না করেন।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক